প্রথম অধ্যায়

নাট্যকার মনোজ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রথম অধ্যায়

মনোজ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী

[এই অধ্যায়টি রচনায় প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে' (মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র / দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩ - জানুয়ারি ২০১১) গ্রন্থটি, 'আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র' (সাক্ষাৎকার ব্রাত্য বসু - ব্রাত্যজন নাট্যপত্র - তৃতীয় সংখ্যা - নভেম্বর ২০১১) সাক্ষাৎকার এবং মনোজ মিত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় প্রাপ্ত তথ্য।]

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ধূলিহর (চলতি কথায় ধুলর) গ্রামে অশোককুমার মিত্র এবং রাধারাণী মিত্রের প্রথম সন্তান মনোজ মিত্রের জন্ম। ছোটোবেলায় তার ডাক নাম ছিল বুদ্ধদেব। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান রাড়ুলি গ্রামের পার্শ্ববর্তী বাঁকা ভবানীপুর গ্রাম ছিল রাধারাণীর বাপের বাড়ি। সেই গ্রাম কপোতাক্ষ তীরে। আর কপোতাক্ষ নদের শাখানদী বেত্রবতী (বেতনা)-র কূলে ধূলিহর গ্রাম। খুলনা রেলস্টেশন থেকে স্টিমারে সাতক্ষীরা এবং সেখান থেকে যে কোনো গাড়িতে পৌঁছতে হ'ত ধূলিহরে। খুলনা জেলা এখন দু'ভাগ হয়ে গেছে। সাতক্ষীরা মহকুমা হয়েছে সাতক্ষীরা জেলা। এখন জেলাশহর সাতক্ষীরা থেকে দু-তিন কিলোমিটার দূরে ধূলিহর। ভৌগোলিক দিক থেকে টাকীর ঠিক ওপারে অর্থাৎ ইছামতীর ওপারটাই সাতক্ষীরা।

মনোজ মিত্রের চতুর্থ ঊর্ধ্বতন পুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র যাদবচন্দ্র, তাঁর পুত্র অন্নদাচরণ। অন্নদাচরণ-হেমনলিনীর তিন পুত্র — অশোককুমার, সৌরীন্দ্রকুমার এবং তারাপদ। একসময় প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল ধূলিহরের মিত্র পরিবারের। বেত্রবতীর দুইধারে ছড়ানো ছিল তাদের জমিজমা, খেতখামার, বাগান। যৌথ জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল মনোজ মিত্রের প্রপিতামহ যাদবচন্দ্র মিত্রের। এ প্রসঙ্গে মনোজ মিত্র লিখেছেন ঃ

> "দূর দূর অঞ্চলের আত্মীয়কুটুম বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে আম-কাঁঠাল-চালতা-সুপুরির বাগান লিখে দিয়ে ধূলিহরের বাসিন্দা বানিয়ে ছাড়তেন তাদের। ছোটবেলায় তাই দেখতাম আমাদেরই স্বজনপরিজনে সারা গ্রাম পরিকীর্ণ। যার সঙ্গেই দেখা হোক না কেন, সে আমার বড় আপনজন।"[১]

জল-জঙ্গলের দেশ খুলনা জেলার মাটি ছিল উর্বর, মানুষ ছিল শান্ত, সরল, সহিষ্ণু আর কিছুটা ঢিলেঢালা ধরণের। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও প্রায় ছিল না বললেই চলে। উদার প্রকৃতির গুণে সেখানকার মানুষও ছিল উদার। সেই উদার প্রকৃতি ও মানুষের সাহচর্যেই কেটেছে মনোজ মিত্রের শৈশব।

অশোককুমার-রাধারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোজ কুমার মিত্র (খাতায় কলমে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পর্যন্ত এই নামটিই ছিল)। ছোটো এক বোন ছিল, যার নাম ডিলডিল (দিলদিল)। তাঁরা যখন কোলকাতায় বেলেঘাটার বাসাবাড়িতে, তখন সেই বোনের অকালমৃত্যু ঘটে। পরের দুই ভাই উদয়ন মিত্র এবং অমর মিত্র। উদয়ন মিত্র ছিলেন স্টেট আর্কাইভসের ডেপুটি ডিরেক্টর। 'জানা অজানা

মহাফেজখানা' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অমর মিত্র বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক। ছোটো বোন অপর্ণা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনোর পর সংসারধর্মে ব্যাপৃত। এছাড়া আরেকটি ছোটো ভাইও তাঁদের ছিল, যে অকালমৃত। মনোজ মিত্রের স্ত্রী আরতি মিত্র এবং কন্যা ময়ূরী মিত্র (ঘোষ)। পিতা-মাতা দুজনেই প্রয়াত। বর্তমানে শ্রী মিত্রের ঠিকানা এ.জি.-৩৫, সল্টলেক, কোলকাতা-৯১।

মনোজ মিত্রের বাবা অশোককুমার মিত্র ছিলেন ধূলিহর গ্রামের প্রথম বি.এ. পাশ। ১৯৩৮ সালে তিনি ধূলিহর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক। বিয়াল্লিশের মন্বন্তরে বাংলার কৃষকেরা ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। মামলায় জড়িয়ে মহাজনদের হাতে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল তারা। সেই মামলার নিষ্পত্তির জন্য ঋণসালিশী বোর্ড যে বিশেষ আদালত গঠন করেছিল সেই ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক ছিলেন অশোককুমার মিত্র। স্বাধীনতার পর তিনি ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিং-এ। মেজকাকা সৌরীন্দ্রমোহন মিত্র তেমন কিছু করতেন না। ছোটোকাকা তারাপদ মিত্র ছিলেন ডাক্তার। ১৯৬৫ পর্যন্ত তিনি ওপার বাংলায় ছিলেন। '৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর চলে আসেন। নিজের বাবা-কাকাদের সম্পর্কে মনোজ মিত্র লিখেছেন ঃ

> "ঠাকুর্দাদার ছেলেরাও বিষয়ে উদাসীন বরাবর। আমার বাবা-কাকারা কোনো জমিজমার ধারকাছ ঘেঁষেন-নি। বড় অদ্ভুত তিনটি ভাই। জীবনে খেলাধুলো করেন নি, তাস-পাশাও নয়। নেশাও করেননি কেউ, পান-যোয়ানও না। থিয়েটার যাত্রাও দেখেন নি কোনোকালে। শুধু এক সমাজসেবামূলক কাজে তাঁদের উৎসাহ দেখেছি সেকালে। বাবা গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ছোটকাকা দাতব্য চিকিৎসালয়।"[২]

১৯৫০ সাল অর্থাৎ নিজের বারো বছর বয়স পর্যন্ত মনোজ মিত্র বাবার চাকরিসূত্রে অখন্ড ও খন্ডিত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন। অনেকসময় বাবা-মাকে ছাড়াই একান্নবর্তী পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে থেকেছেন। বংশের বড় ছেলে বলে হোক বা ছোটোবেলা থেকে রুগ্ন ছিলেন বলেই হোক, ঠাকুমা হেমনলিনী দেবীর অবাধ প্রশ্রয় ও স্নেহ পেয়েছেন তিনি। যে সময়ে এবং পরিবেশে বড় হয়েছেন মনোজ মিত্র, তখন জীবিকা, অর্থোপার্জন প্রভৃতি নিয়ে মানুষ আজকের মতো মাথা ঘামাত না। ফলে নিজের ছোটোবেলায় তিনি দেখেছেন একধরণের শিথিল, অলস, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা। সে জীবনে মানুষের সঙ্গী গাছপালা; সে জীবনে জীবজন্তু-পশুপাখির প্রতি মানুষের পরম মমতা; সে জীবনে চোর এসেছে জেনেও গৃহস্থ বিছানা ছেড়ে না উঠে চোরকে পরদিন মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ করে দেয় আর চোরও নিমন্ত্রণ পেয়ে 'হাতের মাল' ফেলে রেখে চলে যায়; সে জীবনে বাড়িতে নিত্য অতিথিসমাগম; সে জীবনে সকলের সঙ্গেই অদ্ভুত এক আত্মীয়তাবোধ। ছায়াময়, মায়াময় সেই পরিবেশ মনোজ মিত্রের জীবনের গড়ন নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যে সহজ আন্তরিকতা, সরল বিশ্বাসবোধ, উদার সম্প্রীতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন শৈশবের জল-

হাওয়ায়, তাকেই পরবর্তীকালে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন নিজের লেখার মধ্যে।

একালের বাবা-মায়েদের মতো সন্তানের পড়াশুনো নিয়ে নিরন্তর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তাঁর বাবা-মায়ের ছিল না বলে অনেকটা শিথিলভাবেই তাঁর পড়াশুনো শুরু হয়েছিল। তাঁর ভাইয়ের লেখা (শিকড়ের খোঁজে / ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩ - জানুয়ারি ২০১১) থেকে জানা যায়, ১৯৪৫ সালের ৫ জানুয়ারি মনোজ কুমার মিত্র ধূলিহর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে তিনি সেভাবে যাতায়াত করেন নি বলেই মনে হয়। কারণ, তাঁর নিজের লেখায় এই বিদ্যালয়ের কোনো উল্লেখ নেই। বরং একটি সাক্ষাৎকারে (আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র — সাক্ষাৎকার ঃ ব্রাত্য বসু / ব্রাত্যজন নাট্যপত্র - তৃতীয় সংখ্যা - নভেম্বর ২০১১) তিনি জানিয়েছেন যে, ক্লাস সেভেন থেকেই তাঁর প্রথাগত স্কুলজীবন শুরু। তার আগের পড়াশুনো সবটাই বাড়িতে। ধূলিহরে যে গুরুমশাইয়ের কাছে তাঁর হাতেখড়ি, সেই মাদার পন্ডিত তাঁর বাবাকেও পড়িয়েছেন। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলায় আসতেন পন্ডিতমশাই। সেই পড়াশুনো সম্পর্কে একটি কৌতুককর স্মৃতির উল্লেখ করেছেন মনোজ মিত্র 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে' গ্রন্থে। হ্যারিকেনের আলোয় বাড়ির ছেলেদের পড়াচ্ছেন মাদারপন্ডিত। হঠাৎ সেই হ্যারিকেন টেনে নিয়ে পুরোহিতমশাই শুরু করে দিলেন মহাভারত পাঠ। পড়াশুনো লাটে উঠল, জমে গেল ধর্মসভা। এই মাদারপন্ডিত পড়াতেন অত্যন্ত উচ্চস্বরে। সেই চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে দীর্ঘ রোগভোগে শয্যাশায়ী ঠাকুর্দা অন্নদাচরণ চিৎকার করতেন ঃ "তোমাকে আমি একটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি মাদার, আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করো।"[৩] মাদার পন্ডিত আশঙ্কিত ঃ "অশোকের ছেলেটা যে মুখ্যু হয়ে থাকবে কাকা।"[৪] ঠাকুর্দা উত্তর দিতেন ঃ "ছেলেরা তো মুখ্যুই থাকে — বড় হয়ে শিক্ষিত হবে।"[৫] এভাবেই গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল মনোজ মিত্রের লেখাপড়া। লেখাপড়ায় অন্যতম অন্তরায় ছিল ঠাকুমার ভালোবাসা। বইখাতা খুলতে দেখলেই ঠাকুমার মনে হ'ত নাতিটা বোধহয় আর বাঁচবে না। তাড়াতাড়ি তাঁকে ঢাউস খাটের ওপর তুলে নিয়ে শুরু করতেন নিজের জীবনের গল্প। ফলে, পড়াশুনো যে তাঁর হচ্ছে না তা মোটামুটি ধরে নিয়ে সাত-আট বছর বয়সেই বিকল্প ভেবে রেখেছিলেন মনোজ মিত্র ঃ

> "সাত আট বছর বয়েসেই মোটামুটি ধরে ফেলেছিলাম, লেখাপড়া হচ্ছে না। তার জন্যে দুঃখ ছিল না। মোটামুটি ঠিক করে রেখেছিলাম বড় হয়ে কী হব। আট-দশ রকম ভেবেও রেখেছিলাম। জেলে হয়ে মাছ ধরব। তাঁতি হয়ে তাঁত চালাব। স্যাকরা হয়ে গয়না গড়ব। কুমোর হয়ে মাটির হাঁড়ি গড়ব। রাখাল হয়ে গোরু চালাব। ফকির হয়েও গাজনপীরের গান গাইতে পারি।"[৬]

কিন্তু ১৯৪৬ সালে তাঁর জীবনধারায় একটা পরিবর্তন এলো। বাবা দেশে ফিরে তাঁর স্বাস্থ্য, লেখাপড়া এবং আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং নিজেদের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের কর্মক্ষেত্র সিরাজগঞ্জে। ১৯৪৬ পর্যন্তই মনোজ মিত্রের পাকাপাকিভাবে ধূলিহর-বাস। এরপরও ধূলিহরে থেকেছেন, কিন্তু তা বাবার কর্মস্থল বদলের ফাঁকে ফাঁকে, নিরবচ্ছিন্নভাবে আর থাকা হয় নি।

সিরাজগঞ্জে মনোজ মিত্র মাত্র একদিন পড়েছিলেন এক গৃহশিক্ষকের কাছে। সুশ্রী সুশিক্ষিত সেই যুবক প্রথম দিনেই অঙ্কের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকে তিনি আর আসেন নি। পরদিনই তিনি নাকি পাগলাগারদে ভর্তি হয়েছিলেন। সিরাজগঞ্জ থেকে বাবার বদলির সূত্রে এলেন ময়মনসিংহ জেলার ঘাটাইল, সেখান থেকে কালিহাতি। ঘাটাইল আর কালিহাতিতে পালা করে থাকতেন তাঁরা। ঘাটাইলে তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন পুটুবাবু। সকাল-বিকেল দু'বেলাই আসতেন তিনি। একবেলা ইংরেজি-বাংলা, আর একবেলা ইতিহাস এবং মনীষীদের জীবনী। মনোজ মিত্রের রসিকতা ঃ "অঙ্কটা এড়িয়ে যেতাম আমরা দুজনেই। সিরাজগঞ্জের দুর্ঘটনা থেকেই অঙ্কে আমার আতঙ্ক। আর পুটুবাবু মনে হয় একটু কাঁচাই ছিলেন অঙ্কে।"[৭] কিন্তু পুটুবাবুর সাহচর্য অন্যদিক থেকে কাজে লেগেছিল তাঁর। যে কোনো বিষয়ে 'যা মনে আসে লেখা'র আগ্রহ তাঁর মধ্যে চারিয়ে দিয়েছিলেন পুটুবাবুই। 'জোছনারাত্রি', 'নদীর পাড়ে একা একা', 'ঘুড়ি না পাখি, কী হতে চাও তুমি' প্রভৃতি বিষয়গুলিও তিনিই বেছে দিয়েছিলেন। এক বালকের আত্মপ্রকাশের সূচনা সেই পুটুবাবুরই হাত ধরে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ পেল খন্ডিত স্বাধীনতা। সেদিন পর্যন্ত মনোজ মিত্রের বাবার কর্মস্থল ময়মনসিংহ পাকিস্তানে আর পৈতৃক বাসস্থান খুলনা জেলা ভারতে। ১৪ আগস্ট রাতে অশোক কুমার মিত্র পরিবার নিয়ে ময়মনসিংহ ছাড়লেন খুলনার উদ্দেশ্যে। সরকার থেকে তখন তাঁকে বলা হয়েছে তিন মাসের ছুটিতে যেতে, পরে ভারত সরকারের বিদেশ দপ্তরের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ক দপ্তরে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে। সেই ১৪ আগস্ট রাতের বর্ণনা দিয়েছেন মনোজ মিত্র ঃ

> "ওই চোদ্দই রাতেই যখন আমরা মৈমনসিংহ ছাড়ছি, বঙ্গদেশের নানাদিকে তখন তান্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে। হানাহানি, লুটপাট, অগ্নিকান্ড। সর্বত্র দেশত্যাগের হিড়িক। কালিহাতির নদীতে সে রাতে যাত্রীবোঝাই নৌকোর মিছিল। ... নদীর বুকে কাছে দূরে নৌকোর লন্ঠনগুলো ভাঁটার টানে ছুটছে। যেন কার্তিক পূর্ণিমায় পিদিম ভাসানো হয়েছে।"[৮]

বাবার অফিসের কর্মী তায়েজ খাঁ একটা বড় পানসি আর দশ-বারোজন দেহরক্ষী নিয়ে তাদের পৌঁছে দিয়েছিলেন কোলকাতায়। পাকিস্তান তখন স্বাধীন হয়ে গেছে, রাত বারোটায় স্বাধীন হবে ভারত। সেই রাতে নৌকায় রুদ্ধশ্বাসে আরো অনেক মানুষের সঙ্গে দেশ ছাড়ছে, 'নিজের দেশ'-এ যাচ্ছে এক বালক। নদীর পাড়ে পাড়ে স্বাধীনতার কোনো উজ্জ্বল ছবি নেই, কেবল "নিথর রাত্রি ভূতের মতো ঝুলে আছে দু-পাড়ের ঝোপে, ঝাড়ে, ভাঙা মন্দিরে, শূন্য ঘরদুয়োর, গোয়ালঘরে। বাতাসে পোড়া পোড়া গন্ধ।"[৯]

খুলনা জেলায় প্রকৃতিকে দেখেছিলেন এক রূপে, ময়মনসিংহে দেখলেন অন্য রূপে। ঘাটাইলের প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন মনোজ মিত্র ঃ "ঘাটাইলে বাসার সামনে দিগন্ত বিস্তৃত ধানখেত। দিগন্তে গারো পাহাড়ের চুড়ো। মেঘ এলে, বৃষ্টি এলে ছবিটা অপূর্ব হয়ে উঠত।"[১০] খুলনা ছিল জলজঙ্গল

খালবিলের দেশ, কিন্তু ময়মনসিংহ খটখটে ঝকঝকে। যদিও সেখানে ছিল যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের মতো বিশাল নদী আর তাদের অজস্র শাখা-প্রশাখা। এমনিতে শুকনো জায়গা হলেও ব্রহ্মপুত্রের জলে হঠাৎ হঠাৎ বন্যা হ'ত ময়মনসিংহে। আকস্মিক সেই বন্যা মোকাবিলায় প্রত্যেকের বাড়িতেই প্রস্তুত থাকত ভেলা বা নৌকো। প্রকৃতির এই অন্যতর রূপও সমৃদ্ধ করেছে মনোজ মিত্রের জীবনকে, জীবনবোধকে। ময়মনসিংহের আর একটি বিষয় প্রভাব ফেলেছে তাঁর ওপর। তা হ'ল, রুক্ষতার ছদ্মবেশে গোপন রসিকতা। ফল্গুধারার মতোই রুক্ষ ব্যবহারের আড়ালে বহমান এই রসিকতা। পরবর্তীকালে 'সাজানো বাগান', 'পরবাস', 'কেনারাম বেচারাম', 'দম্পতি' প্রভৃতি নাটকে যে বক্র রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার বীজ নিহিত রয়েছে ময়মনসিংহের সেই ছদ্ম রসিকতার মধ্যে।

১৪ আগস্ট রাতে রওনা দিয়ে ১৫ আগস্ট প্রায় মধ্যরাতে তাঁরা পৌঁছলেন কোলকাতায়। সেখানে রাতটুকু শিয়ালদায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পরদিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট চাপলেন খুলনার ট্রেনে। ট্রেনে এবং বিভিন্ন স্টেশনে সেদিন স্বাধীনতার বিপুল আনন্দ। ১৬ আগস্ট বিকেলে খুলনা স্টেশনে পৌঁছনো গেল। কিন্তু রাতে সাতক্ষীরা যাবার কোনো স্টিমার নেই। ভোরে যে স্টিমার যাবে রাতে সেটাতেই থেকে পিকনিকের আয়োজন করা হ'ল। স্বাধীনতার আনন্দে তখন সবাই মশগুল। বিশেষত নিজেদের জন্মভিটে প্রত্যাশিত দেশ ভারতেই পড়েছে। ছোটো রঙিন ছাতা স্বাধীনতার উপহার পেলেন মনোজ মিত্র। ভোরে স্টিমার ছাড়ল খুলনার উদ্দেশ্যে। ঘুম ভেঙে উঠে বালক মনোজ দেখলেন, অন্য একটা জায়গা, বাবা নেমে গেছেন চা খেতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে জানালেন দুঃসংবাদ — খুলনা চলে গেছে পাকিস্তানে, আর মুর্শিদাবাদ এসেছে ভারতে। মুহূর্তে স্বদেশ হয়ে গেল বিদেশ, আনন্দ পরিণত হ'ল বিষাদে। স্বাধীনতার উপহার মনোজ মিত্র হারিয়েছিলেন স্টিমারে, সেইসঙ্গে হারিয়েছিলেন স্বাধীনতার আনন্দও। সেদিন ১৭ আগস্ট, ১৯৪৭ সাল।

স্বাধীনতার পর আরো তিন বছর অর্থাৎ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মিত্র পরিবারের কেউ কেউ ওখানে ছিলেন। ছোটোকাকা তো ছিলেন ১৯৬৫ পর্যন্ত। মনোজ মিত্র সেইসময় কখনো থাকছেন বাবার কর্মস্থল ঢাকায়, কখনো নিজেদের গ্রাম ধূলিহরে। এই গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা শিক্ষিত হিন্দুদের ওপর এতটাই নির্ভরশীল ছিলেন যে, হিন্দুদের গ্রাম ছেড়ে যেতে দেখলে নির্ভরহীনতার ভয় থেকেই তারা কান্নাকাটি করছিলেন। তার ঠাকুর্দা অন্নদাচরণকে তারা বারবার মিনতি করতে লাগলেন গ্রাম ছেড়ে, দেশ ছেড়ে না যাবার জন্য। তাদেরই আগ্রহে মিত্র বাড়ির বন্ধ হতে বসা 'বড় পূজা' (দুর্গাপূজা) আবার হ'ল। বাইরের লোকের সাম্প্রদায়িক উস্কানি বন্ধ করতে 'সাজাহান' নাটকের অভিনয় হ'ল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই উপভোগ করল, ভেতরকার শ্লেষটা ধরতে পেরে দায়িত্বশীল হয়ে উঠল।

ওপার বাংলার মিত্র পরিবারে কেউ কোনোদিন থিয়েটার করেন নি, এমনকি দেখেনও নি। থিয়েটার তাঁদের কাছে একরকম বর্জনীয়ই ছিল। কিন্তু গ্রামে সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে সেই পরিবারকেই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হ'ত। প্রতি দুর্গাপূজা আর বসন্তকালে গ্রামে তিন-চার রাত্রি যে থিয়েটার হ'ত তার দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, মঞ্চ বাঁধার তক্তা-বাঁশ-দড়ি, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি

সবকিছু ডাঁই করা থাকত তাঁদেরই বাইরের ঘরে। গৃহবন্দী সেই অসংখ্য থিয়েটারই মনোজ মিত্রের মধ্যে প্রথম থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ জাগিয়ে তোলে। তাঁদেরই চন্ডীমন্ডপের উঠোনে থিয়েটার হ'ত আর মেজকাকু বেত হাতে ঘুরে বেড়াতেন, যেন বাড়ির ছেলেরা আশেপাশে উঁকিঝুঁকি না দিতে পারে। থিয়েটারকে এইভাবে নিষিদ্ধ জগতের বিষয় করে রাখাতেও তার প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ প্রবল হচ্ছিল। স্বাধীনতার পর খুলনা পাকিস্তানে পড়ায় মেজকাকার বেত নিয়ে ছেলেদের তাড়া করার ইচ্ছে মরে যাওয়ায় এবং 'রামের সুমতি'র মতো আপত্তিহীন নাটক অভিনীত হবে বলে ১৯৪৭ সালে নয় বছর বয়সে মনোজ মিত্র প্রথম নাটক দেখার সুযোগ পেলেন। সেই অভিনয়ে প্রপস্ হিসেবে জ্যান্ত দুটি মাছের ব্যবহার থিয়েটারে বাস্তবতার বিষয়টিকে তাঁর মাথায় যেভাবে গেঁথে দিয়েছে, পরবর্তীকালে নিজের অভিনয়ে সেই বাস্তবতা আমদানি করতে গিয়ে তিনি বহুবার বিব্রত এবং অপ্রস্তুত হয়েছেন। আরো দু'বছর পরে গ্রামেরই বিজয়া সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথের 'রোগের চিকিৎসা' হাস্য কৌতুকটিতে মনোজ মিত্রের প্রথম অভিনয়। দুষ্টু ছেলে হারাধনের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন। নির্দেশক 'বড়দা'র তৈরি তুলোর হাঁসের পরিবর্তে জামার নিচে জ্যান্ত হাঁস বেঁধে মঞ্চে ঢুকেছিলেন তিনি। নির্দিষ্ট সময়ে বাইরে থেকে বড়দা হাঁসের ডাক ছাড়ছেন, আর জামার নিচে আসল হাঁসও ডাক ছাড়ছে। সেই অভিনয় দর্শকদের চমৎকৃত করলেও বুকে-পেটে হাঁসের নখের অসংখ্য রক্তাক্ত আঁচড় তাকে সইতে হয়েছে। কিছু কুচক্রী মানুষের ষড়যন্ত্রে শান্ত জায়গা খুলনাতেও যখন সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াতে শুরু করেছে তখন সাংস্কৃতিক মোকাবিলার লক্ষ্যে মনোজ মিত্রের মেসোমশায়ের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে অভিনয় করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান'। এই নাটকে দারার ছেলে সুলেমানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মনোজ মিত্র। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এই অভিনয় কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল।

১৯৫০ সালে বারো বছর বয়সে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকাপাকিভাবে ভারতে চলে এলেন মনোজ মিত্র। তাঁদের পরিবার তখন তিন টুকরো। বাবা ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে কর্মরত, ধূলিহরে ছোটোকাকার সঙ্গে ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আর কোলকাতা বেলেঘাটায় এক কাকা-কাকিমা এবং মায়ের সঙ্গে বারোয়ারিতলায় দশ নম্বর বাড়িতে মনোজ মিত্র। গ্রামের সহজ আন্তরিকতা, একান্নবর্তী পরিবার, মায়াময় পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে শিকড়ছিন্ন অবস্থায় কোলকাতায় আসতে হয়েছিল বলে সেই প্রথম থেকেই যেন নগর কোলকাতার প্রতি তাঁর একটা বিমুখতা। যদিও জীবনের অধিকাংশ সময় কোলকাতাতেই থাকছেন, তাঁর কর্মকান্ডও কোলকাতাকেন্দ্রিক, কিন্তু অন্তর থেকে তিনি কোনোদিনই এই শহরকে ভালোবাসেন নি। নগরে বাস করেও সবসময় অন্তরে লালন করেছেন গ্রামের জন্য মমতা। তাই তাঁর নাটকে মানুষ-মাটি-প্রকৃতির এত আন্তরিক এবং বিপুল আয়োজন। কোলকাতার প্রতি অননুরাগের কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন ঃ

> ''কলকাতা আমায় সেভাবে কোনওদিনই কাছে টানে নি — কেননা আমরা তো এক একজন এক এক জায়গায় ছিটকে গেলাম — ঠাকুরদা ঠাকুমারা রয়ে গেলেন দেশে — আমরা চলে এলাম এখানে — সব সময়ে একটা অনিশ্চয়তা, একটা আতঙ্ক — বাবা চলে গেলেন ঢাকায় — পরিবারটা তিনজায়গায় কিরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। — আরেকটা ব্যাপার ছিল — পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক লোকজন তখন এখানে চলে এসেছে — ... এইসব ছিন্নমূল লোকজনের দারিদ্র, অসহায়তা চোখের সামনে দেখেছি — ফলে কলকাতাকে যে খুব একটা ভালো লেগেছে সে সময় — তা বলা যায় না — আলাদা করে চেনারও ইচ্ছে জাগেনি।''[১১]

বেলেঘাটায় তাঁরা ছিলেন ছয় মাস। সেখানে ট্যাংরার কাছে ভূতনাথ মহামায়া ইনস্টিটিউশনে তিনি সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্কুলজীবন শুরু। দেশ ভাগ হয়ে গেলেও দেশের মায়া কাটানো যায় না, শিকড়ের টান এড়ানো যায় না। ঠাকুর্দা অন্নদাচরণ গ্রাম ছাড়া বাঁচার কথা ভাবতেই পারেন না। তিনি ওপার বাংলার ধূলিহর গ্রামের সমস্ত মানুষজনকে উঠিয়ে এনে এপার বাংলার একইরকম একটি গ্রাম গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সে পরিকল্পনা সফল না হলেও তিনি এপারে বাড়ি করেছিলেন চব্বিশ পরগণা (অধুনা উত্তর চব্বিশ পরগণা) জেলার বসিরহাট-টাকীর মাঝখানে দন্ডিরহাট গ্রামে। ধূলিহর থেকে দন্ডিরহাট খুব বেশি দূরত্ব নয় — সাইকেলেই যাতায়াত সম্ভব ছিল, যতদিন পর্যন্ত পাসপোর্ট ভিসা চালু হয় নি। বাধ্য হয়ে 'দেশ' ছেড়ে এলেও এ যেন দেশের কাছাকাছি থাকার আপ্রাণ প্রয়াস। ১৯৫০ সালের আগস্ট মাসে বেলেঘাটার বাসা থেকে সকলে গেলেন দন্ডিরহাটের বাড়িতে। সেখানে মনোজ মিত্র ভর্তি হলেন নগেন্দ্রকুমার উচ্চশিক্ষা নিকেতনে।

এই স্কুলে তিনি থিয়েটার চর্চার অবকাশ পেয়েছিলেন। স্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই সুধীর বসু ছিলেন সেই স্কুলের থিয়েটারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও নির্দেশক। এই স্কুলে দুটি রবীন্দ্র-নাটকে অভিনয় করেছিলেন তিনি — 'ডাকঘর' এবং 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। দু'টি নাটকেই থিয়েটারকে 'সত্যি' করে তুলতে গিয়ে তিনি চরম বিব্রত হয়েছিলেন। 'ডাকঘর'-এ দইওয়ালার ভূমিকায় অভিনয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে গিয়ে এক বন্ধুর বাবার তৈরি জমাট দইয়ের হাঁড়ি উপুড় করে ঝাঁকাতে গিয়েই বিপত্তি — মঞ্চে বিশ্বাসঘাতক দইয়ের ঢল এবং অভিনয়ের আকস্মিক সমাপ্তি। আরেকবার 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে নস্যি টেনে হাঁচির প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হলে মাঝপথে ড্রপসিন ফেলে দিতে হয়। পরে যখন তাঁরা বেলগাছিয়ায় থাকছেন তখন টালা পার্কের যুব উৎসবে বেলগাছিয়া পাইকপাড়ার ছেলেমেয়েরা তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' অভিনয় করবে। সেই অভিনয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার ছোটো ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে আবার সেই সত্যের প্রতি ঝোঁক এবং আবার বিপত্তি। আসল ব্যান্ডেজ বেঁধে মঞ্চে ওঠার লোভে এক বৃদ্ধ কম্পাউন্ডারকে বেশি ফিস্ দিয়ে নিয়ে এসে মঞ্চের পাশে বসিয়ে আসল ব্যান্ডেজ বাঁধিয়ে নিলেন। অভিনয় জমল ভালোই, কিন্তু নির্জলা টিঞ্চার আয়োডিনে আধখানা মুখ পুড়ে কালো। তিন মাসের চিকিৎসায় সেই কালি দূর হয়েছিল। থিয়েটারের জীবন-ঘনিষ্ঠতার প্রতি আকর্ষণের এই বিষয়টিকে মনোজ মিত্র নিজে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

> "তবে জীবনের প্রথম থিয়েটার দেখাটা — প্রথম মুগ্ধতা — সেই দুটো মাছ — কেবলই যে আমাকে ঠকাল এমন তো নয় নিশ্চয়ই। জিতিয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশিবার। জীবনানুগ বা জীবনানুরূপ হয়ে উঠতে হবে, একজন অভিনয়-শিল্পীর এই যে প্রত্যয়, জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে পাল্টা জীবন গড়তে হবে চৌখুপি মঞ্চে — এই যে জিদ — এ যদি নাই থাকে কারও, তবে সে আর কোন্ কর্মে ঢুকবে মঞ্চে ?"[১২]

১৯৫৪ সালে নগেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষা নিকেতন থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে তিনি কোলকাতায় পড়তে এলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হলেন। এখানে পেলেন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার উপযুক্ত পরিসর এবং সঙ্গী। স্কটিশে তাঁর সহপাঠী ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সুভদ্র সেন,

প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রিয়ব্রত দেব, নৃপেন্দ্র সাহা, প্রতুল চৌধুরী, দেবকুমার ভট্টাচার্য, অতনু সর্বাধিকারী প্রমুখ। সুশীল মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ অধ্যাপকের পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল তাঁদের চর্চায়। আনন্দ বাগচী, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন তাঁদের সিনিয়র। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত মনোজ মিত্র প্রধানত গল্পকার হবার চেষ্টা করছেন। স্কুল এবং তারপর কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি 'মাসিক বসুমতী' ও 'মন্দিরা' কাগজে গল্প লিখেছেন। প্রথম বর্ষে যখন দর্শন সাম্মানিক নিয়ে পড়ছেন তখন আনন্দ বাগচী, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে 'মহুয়া' নামে যে দেওয়াল পত্রিকা বের করেছিলেন, সেখানে 'বেতনার চর' এবং 'বাঁশি' নামে দুটি ছোটোগল্প লিখেছিলেন। স্কটিশেরই অন্যতম সহপাঠী লালমোহন 'ছোটগল্প' নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করতেন তাতেও বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন মনোজ মিত্র। বিজিত দত্ত, সুভদ্র সেন, নৃপেন্দ্র সাহা-র সঙ্গে 'যাত্রী' পত্রিকা চালানোতে তিনিও ছিলেন। সেই পত্রিকায় তিনি লিখতেনও। অনেকের গল্প নিয়ে 'অন্য স্রোত' নামে একটি গল্পসংকলন তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। এই সংকলনের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন অন্নদা মুন্সী, ভূমিকা লিখেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'জয়তী' সাহিত্য পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। এইসময় তাঁরা থাকছেন বেলগাছিয়া ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাসাবাড়িতে। ১৯৫৭ সালে যখন তিনি স্কটিশে বি.এ.পড়ছেন তখন পার্থপ্রতিম চৌধুরী, অতনু সর্বাধিকারী প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করলেন 'সুন্দরম্'। সেখানে 'পথের পাঁচালী' এবং 'সিঁড়ি' নাটকে তিনি পার্থপ্রতিম চৌধুরীর নির্দেশনায় অভিনয় করেন।

১৯৫৮ সালে বি.এ. পাশ করে মনোজ মিত্র কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন দর্শনে এম.এ. পড়তে। ১৯৬০ সালে তিনি এম.এ. পাশ করেন। স্কটিশ চার্চে পড়ার সময় থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে তিনি পুরোপুরি জড়িয়ে গেছেন। কলেজে থিয়েটার করছেন, কলেজের ছেলেমেয়েরা মিলে বাইরে রঙমহলে, শ্রীরঙ্গমে অভিনয় করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন কলেজের মধ্যে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ ছিল না। এইসময় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার আকর্ষণে বাড়িতে পড়াশুনোর চাপের কথা বলে তিনি কিছুদিন হস্টেলেও থাকেন। ১৯৫৯ সালে থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 'সুন্দরম্' যখন নাটক খুঁজে পাচ্ছে না তখন এম.এ. ক্লাসের ছাত্র ২১ বছর বয়সী মনোজ মিত্র লিখলেন তাঁর প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল'। 'সুন্দরম্' এই নাটকটি অভিনয় করে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। নিজের ব্যাধিগ্রস্ত জীবনপিয়াসী ঠাকুর্দাকেই তিনি এই নাটকে রূপ দেন। বঙ্কিম চরিত্রটিতে তিনি নিজেই অভিনয় করতেন। 'মৃত্যুর চোখে জল' লেখার পর থেকে তিনি নাটক ছাড়া আর কিছু লেখেন নি। নীতিগত বিরোধের কারণে তিনি ১৯৬০ সালে 'সুন্দরম্' থেকে বেরিয়ে আসেন, সঙ্গী অতনু সর্বাধিকারী। তখন কিছুদিন অভিনয় করেন 'গন্ধর্ব' নাট্যসংস্থায়। নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত 'গন্ধর্ব' নাট্য পত্রিকায় তাঁর 'মোরগের ডাক' আর 'নীলকণ্ঠের বিষ' নাটক দুটি ছাপা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আবার 'সুন্দরম্'-এ ফিরে আসেন।

'এসব লিখে জলঘোলা না করাই ভালো' — মনোজ মিত্র রচিত প্রথম নাটকের দু-একটা পৃষ্ঠা উল্টে একথাই বলেছিলেন তাঁর বাবা অশোককুমার মিত্র। তিনি ছিলেন দর্শনের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। জীবনে থিয়েটার-সিনেমা দেখেন নি, নাটক-নভেল পড়েন নি। ছেলেদের লেখালেখি নিয়েও তাঁর

কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিল, বড়ছেলে পড়াশুনো নিয়েই থাকুক, দর্শনে গবেষণা করে শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত হোক। মনোজ মিত্রের নিজেরও পড়াশুনো করে অধ্যাপক হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, আবার থিয়েটার ছাড়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরবর্তীকালে তিনি উভয় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন, কিন্তু সেই সময়, ১৯৬০-৬১ সালে তিনি পড়াশুনো এবং থিয়েটার নিয়ে দোটানাতেই পড়েছিলেন। এই দোদুল্যমানতাকে নিজের চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি নিজেই। থিয়েটার এবং অধ্যাপনার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে তিনি চেয়েছিলেন কোলকাতার আশেপাশে কোনো কলেজের চাকরি। কিন্তু তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তাঁকে কোলকাতা থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে, কেবল তাহলেই 'থিয়েটারের ভূত' তাঁর মাথা থেকে নামানো যাবে, তিনি উচ্চতর পড়াশুনোয় মনোযোগী হতে পারবেন। বাবার এই চাওয়াটা এত প্রবল ছিল যে, কোলকাতার কাছে মগরা কলেজে মনোজ মিত্রের চাকরির নিয়োগপত্র তাঁর হাতে পড়লে তিনি গোপনে তা ছিঁড়ে ফেলেন। কারণ, মগরা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে থিয়েটার চালিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। এরপর সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ডাক এলে বন্ধু অতনুকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যোগ দিতে যান মনোজ মিত্র। যোগ দেবার পরদিনই ভোরবেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে,তখন হঠাৎ কোলকাতার জন্য, থিয়েটারের জন্য মন কাতর হয়ে পড়ায় তিনি বন্ধু অতনুর সঙ্গে ফেরার রিক্সায় চেপে বসেন, ফিরে আসেন কোলকাতায়। ১৯৬১ সালে তিনি যোগ দিলেন রানিগঞ্জের ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজে। ভারাক্রান্ত মনে কোলকাতা থেকে, থিয়েটার থেকে বিদায় নিয়ে চললেন অধ্যাপনার কাজে। সঙ্গে নিলেন শ্যামবাজারের বিশেষ একটি দোকান থেকে কেনা পোকায় কাটা রুলটানা খাতা, যাতে লিখতেই তিনি তখন স্বচ্ছন্দ।

থিয়েটারই যখন ছেড়ে দিতে হ'ল, তখন তীব্র অভিমানে তিনি স্থির করলেন, আর নাটক লিখবেন না। পোকায় কাটা খাতা গবেষণার কাজে ব্যয় করার সংকল্প নিয়ে গবেষক হিসেবে নাম নথিভুক্ত করলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় Ethical Scepticism বা নৈতিক সংশয়বাদ। তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু থিয়েটার যাকে নেশাগ্রস্ত করেছে তিনি আর কতদিন অভিমান করে থাকবেন। গ্রীষ্মের ছুটি, পুজোর ছুটি তো বটেই, সপ্তাহান্তে কোলকাতায় এসেও তিনি তখন 'সুন্দরমে'র অভিনয়ে অংশ নিচ্ছেন। রানিগঞ্জে একবার তাঁর ওখানে বেড়াতে যান নাট্যকার মন্মথ রায়। মূলত তাঁরই প্রেরণায় রানিগঞ্জে থাকতেই মনোজ মিত্র লিখলেন পুরাণাশ্রিত নাটক 'অশ্বত্থামা' (১৯৬৩)। রানিগঞ্জ কলেজের অধ্যাপকেরা এই নাটকের অভিনয়ও করেছিলেন। গবেষণা যতারীতি স্থগিত থেকে যায়। তত্ত্বাবধায়কের চিঠি আসে, লজ্জায় কোলকাতা যাওয়া হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই অধ্যাপক প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় অকালে দেহত্যাগ করে গবেষক ছাত্রকে লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দেন।

১৯৬৪ সালে রানিগঞ্জে স্থায়ী চাকরি ছেড়ে তিনি অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ নিয়ে আসেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজে। সেখানে তাঁর সহকর্মী ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। সব অধ্যাপকরা মিলে এখানে 'অলীকবাবু' অভিনয় করেন। 'অলীকবাবু'র ভূমিকায় মনোজ মিত্র। কোলকাতায় তখন শ্যামল ঘোষ 'গন্ধর্ব' থেকে বেরিয়ে তৈরি করেছেন 'নক্ষত্র'। তিনি সেখানে ডাকলেন, পার্থপ্রতিম চৌধুরী ডাকলেন

'সুন্দরম্'-এ। কিন্তু কোথাও যোগ না দিয়ে কয়েকজন মিলে গড়লেন নতুন দল 'ঋতায়ন'। এখানে তিনিই নাট্যকার এবং নির্দেশক। অভিনয়ও করেছেন সব নাটকেই। 'অবসন্ন প্রজাপতি', (১৯৬৫), 'নীলা' (১৯৬৫), 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৬৬), 'সিংহদ্বার' (১৯৬৬), 'ফেরা' (১৯৬৬), 'লঘুগুরু' (১৯৬৭), 'নেকড়ে' (১৯৬৮) প্রভৃতি নাটক এখানে অভিনীত হয়। কিন্তু ঋতায়নে অভিনয় জমছে না দেখে ১৯৭০ সালে সভা ডেকে এই দলের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৬৫ সালে তিনি যোগ দিয়েছেন নিউ আলিপুর কলেজে। এখানে থাকার সময় আর একবার (১৯৬৭-৬৯) তাঁর গবেষণার ঝোঁক চেপেছিল। বিষয় 'Configuration Theory of Art' বা 'শিল্পে রূপসর্বস্বতাবাদ'। সে সময় প্রায় দু-আড়াই বছর থিয়েটার ভুলে পড়াশুনো নিয়েই লেগে ছিলেন। কিন্তু এবারও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্যের অকালপ্রয়াণে গবেষণা শেষ হ'ল না। তাঁর নিজের কৌতুক— "এরপর আর গবেষণা কর্মে মাথা গলানো সাহসে কুলোয় নি।"[১৩] এখানেই তাঁর প্রথাগত পড়াশুনোর সমাপ্তি।

'ঋতায়ন' বন্ধ হয়ে যাবার পর 'দলহীন' মনোজ মিত্র বাড়িতে বসে লেখালেখি করছেন। 'চাক ভাঙা মধু' এই সময় লিখেছেন। পার্থপ্রতিম চৌধুরী নাটকটি চাইলেন 'সুন্দরম্'-এর জন্য। সেখানে নাটকটি দিয়ে দেবার পর মনোজ মিত্র বুঝতে পারলেন, 'সুন্দরম্' এই নাটক অভিনয় করতে পারবে না। দলের অবস্থা ছন্নছাড়া। পার্থপ্রতিম ছবির কাজে ব্যস্ত, থিয়েটারে সিরিয়াস নন। বেশ কিছুদিন মনোজ মিত্র (মাতলা) এবং অপর্ণা সেন (বাদামী) দুজন মিলেই রিহার্সাল দিয়েছেন। কিন্তু শেষে বোঝা গেল, 'সুন্দরম্' এই নাটক অভিনয় করতে পারবে না। ১৯৭২ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপ এই নাটক প্রয়োজনা করে। 'চাক ভাঙা মধু' হাতছাড়া হাওয়ায় পার্থপ্রতিম চৌধুরী খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। ১৯৭০-৭৪ মনোজ মিত্র কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নন। 'সুন্দরম্'ও তখন বন্ধ। ১৯৭১ থেকে ৭৩ মনোজ মিত্র কোনো নাটক রচনা করেন নি। দলহীনতাই এর কারণ হওয়া সম্ভব। ১৯৭৫-এ মনোজ মিত্রের নেতৃত্বে আবার 'সুন্দরম্'-এর যাত্রা শুরু হয় 'পরবাস' নাটক দিয়ে। তখন থেকে তিনিই এই দলের প্রধান নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা। তাঁর সঙ্গে তখন ছিলেন দুলাল ঘোষ, মানব চন্দ্র, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, অরণ্য ঘোষাল প্রমুখ। ২০০৭ সালে তাঁরই নেতৃত্বে 'সুন্দরম্' নিজেদের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। 'পরবাস'-এর পর ১৯৭৭-এ এল সেই সন্ধিক্ষণ, লেখা হ'ল বাংলা নাটক ও থিয়েটারের মাইলস্টোন 'সাজানো বাগান'। ৫ এপ্রিল ১৯৭৭ তারিখে অবনমহলে 'সাজানো বাগান'-এর প্রথম অভিনয় দর্শক-প্রশংসিত হলেও নাট্যকারের পছন্দ হয় নি সেই নাটক। শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বটাই প্রবল হয়ে ভেতরের রসবোধ হারিয়ে গিয়েছে বলে তাঁর মনে হচ্ছিল। তাই নতুনরূপে লেখা হ'ল নাটকটি, অভিনয় হ'ল ৭ নভেম্বর ১৯৭৭, মুক্ত অঙ্গনে। এই অভিনয়ের পর থেকেই মূলত 'সুন্দরম্' এবং মনোজ মিত্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৮০ সালে 'সাজানো বাগান' অবলম্বনে 'তপন সিংহ' ছবি করেন 'বাঞ্ছারামের বাগান'। নাম ভূমিকায় মনোজ মিত্র। সেই প্রথম মনোজ মিত্রের সিনেমায় অভিনয় এবং প্রথম অভিনয়ই ইতিহাস। বাঞ্ছারামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে গেছেন মনোজ মিত্র। বাঞ্ছারাম যেন তাঁরই অন্যতর সত্তা। এই চরিত্রটিকে নিয়ে তিনি বহুবার বহুরকমভাবে ভেবেছেন, বাঞ্ছারামকে, বাঞ্ছারামের জীবনবোধকে নিজের জীবনে বহুভাবে উপলব্ধি করেছেন। 'বাঞ্ছারামের

বাগান'-এ অভিনয়ের পর থেকে তিনি সমানতালে থিয়েটার ও সিনেমায় অভিনয় হয়ে চলেছেন। সেই সঙ্গে রয়েছে নাটক রচনা এবং নির্দেশনার কাজ। মূলত 'শত্রু' সিনেমার পর থেকে তিনি বাংলা সিনেমার খ্যাতিমান কমিক ভিলেন। নিজের একাধিক সত্তার মধ্যে নাট্যকার সত্তাটিকেই এগিয়ে রাখতে চেয়েছেন তিনি নিজে।

কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি থিয়েটারে অভিনয় করতে কোনো সংকোচ বোধ করেন নি মনোজ মিত্র। কারণ বাংলাদেশের সমাজে নাটক-থিয়েটার বরাবরই গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষিত মানুষের পক্ষে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থাকাই ছিল সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু সিনেমা সম্পর্কে একথা খাটে না, বিশেষত বিশ শতকের সেই সত্তর-আশির দশকে। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি নিজেই এ বিষয়ে রক্ষণশীলদের দলে। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনার সঙ্গে সিনেমায় অভিনয়কে মেলানোর মতো মানসিক প্রসারতা যে তাঁর নেই, সেকথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। অথচ অনেকদিন পর্যন্ত কার্যক্ষেত্রে দুটি বিষয়ই একসঙ্গে চালিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর সকুণ্ঠ কৈফিয়ৎঃ "আমার দিক থেকে বলার এইটুকু, কোনোটাকে ছাড়তে মন চায় না। দুটোকেই আমি ভালোবাসি। আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে।"[১৪] ১৯৮০ সালে 'বাঞ্ছারামের বাগান' মুক্তি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। দ্বিধা কিছুটা ঘোচে। ১৯৮৬ সালে দর্শন বিষয় এবং নিউ আলিপুর কলেজ ছেড়ে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত হন। অভিনয় ও নাট্যচর্চার সঙ্গে অধ্যাপনাকর্মের বিবাদ এবার পুরোপুরি ঘুচল। সিনেমা করা নিয়ে এরপর আর সংকুচিত থাকতে হয় নি তাঁকে। কারণ কর্মক্ষেত্রের আনুকূল্য পেয়েছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার মনে করতেন যে, নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভাগের অধ্যাপকদের পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে প্রায়োগিক উৎকর্ষতা থাকা জরুরি। সেজন্য তাঁদের নিয়মিত পেশাদারি অনুষ্ঠান করা উচিত। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পাকাপাকিভাবে চলে আসার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের তৎকালীন প্রধান তরুণ রায়। ১৯৯৪ সালে তিনি উক্ত বিভাগে 'শিশির কুমার ভাদুড়ী অধ্যাপক' পদে যোগ দেন। ২০০৩ সালে সেখানে থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০৫ সালে তাঁর বাইপাস হার্ট অপারেশান হয়।

মনোজ মিত্র একইসঙ্গে নাটক রচনা, অভিনয়, নির্দেশনার পাশাপাশি সিনেমাতেও চুটিয়ে অভিনয় করছেন। তপন সিংহ, সত্যজিৎ রায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর মতো প্রখ্যাত পরিচালকদের পাশাপাশি অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী, প্রভাত রায়, রাজা সেন, রাজ চক্রবর্তী প্রমুখ অসংখ্য প্রবীণ-নবীন চলচ্চিত্র পরিচালকের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। বেশ কয়েকটি দূরদর্শন ধারাবাহিকেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর নাটক ও থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা। এ পর্যন্ত ছোটো, বড়ো, রূপান্তর মিলিয়ে তাঁর নাটকের সংখ্যা নব্বই-এর অধিক। এর মধ্যে একটি নাটকও কোনো বিদেশি নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর নয়। অর্থাৎ তাঁর নাটক রচনার শিকড় প্রোথিত দেশজ মাটিতে। এই বিপুল সংখ্যক নাটকের বাইরেও তিনি আকাশবাণীর জন্য অনেক প্রখ্যাত লেখকের গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন। 'সাজানো বাগান' ছাড়াও তাঁর 'কেনারাম বেচারাম', 'নরক গুলজার',

'দম্পতি' ও 'বৃষ্টির ছায়াছবি' নাটকগুলি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। কয়েকটি সিনেমার চিত্রনাট্যও তিনি রচনা করেছেন। এছাড়া 'বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায়', 'মনের কথা নাট্যকথা', 'বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ', 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে' (ছোটোভাই অমর মিত্রের সঙ্গে একত্রে) প্রভৃতি সুখপাঠ্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। আজও তিনি সমানভাবে সৃজনশীল, নতুন নতুন ভাবনা এবং আঙ্গিক প্রকাশে সাবলীল।

দীর্ঘ সৃজনশীল জীবনে তিনি অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল ১৯৭৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র পুরস্কার (এই পুরস্কারের প্রাপক নির্বাচনের ভার ছিল সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের ওপর), ১৯৮০ সালে চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার, ১৯৮১ ও ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার, ১৯৮৫ সালে নাটক রচনার জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৬ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের জন্য সত্যেন মিত্র পুরস্কার, ১৯৯১ সালে নান্দীকার জাতীয় নাট্যোৎসব সম্মাননা, ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম জার্ণালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার, ২০০৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত স্বর্ণপদক, ২০১০ সালের দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার (প্রাপ্তি ২০১২ সালে) প্রভৃতি।

মনোজ মিত্রের বিভিন্ন লেখা, রচিত নাটক, প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, ঘনিষ্ঠজনেদের লেখা প্রভৃতি থেকে যে মানুষটির পরিচয় ফুটে ওঠে তিনি চিরন্তন মূল্যবোধে আস্থাশীল, মানুষের শুভবোধে বিশ্বাসী, শিকড়সন্ধানী, ঐতিহ্যপ্রিয়, গ্রামীণ সহজতায় স্বস্তি পাওয়া, আধুনিকতার অতিরেকের প্রতি বিরূপ, কৌতুকপ্রিয়, অন্তর্মুখী, নম্রস্বভাব, আদ্যন্ত থিয়েটারপ্রেমী একজন মানুষ। অন্য মাধ্যমে কাজ করলেও থিয়েটারই তাঁর প্রথম প্রেম। নাটক-থিয়েটারের কাজে কোনো ফাঁকি না পড়ে, সে বিষয়ে সবসময় তিনি সচেতন থেকেছেন। 'সুন্দরম্'-এ পার্থপ্রতিম চৌধুরী সিনেমায় বেশি ঝুঁকে পড়ায় দল একসময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই মনোজ মিত্র যখন সিনেমায় নামলেন তখন দলের আশঙ্কা তীব্র হয়েছিল। সেজন্যই তিনি ছিলেন অতিরিক্ত সতর্ক ঃ

> "বাঞ্ছারামের বাগান করার সময় আমি তটস্থ ছিলাম — আমার সম্পর্কে সুন্দরমের বন্ধুদের সন্দেহ যেন সত্যি না হয়। সিনেমা যেন আমার থিয়েটারকে গিলে না ফেলে। সত্যি বলতে কী, থিয়েটারে বেশি মনোযোগ দিয়েছি সিনেমা করার পরেই।"[১৫]

'শত্রু' সিনেমা করার পর সেই সিনেমার হিন্দি ভার্সানে অভিনয় করার জন্য তাঁর কাছে মুম্বই যাবার প্রস্তাব এসেছিল। সেই সময় পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা পাওয়া ছাড়া আরো কয়েকটি হিন্দি ছবিতে হয়তো অভিনয়ও করতে পারতেন। কিন্তু থিয়েটারকে (এবং অধ্যাপনাকেও) ভালোবেসে এবং থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার বাসনায় সেই আহ্বান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে ('আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র') এই কথাটিও তিনি কিন্তু ব্যক্ত করেন কোনোরকম গর্ব বা অহঙ্কার করে নয়, বরং নিতান্ত কুণ্ঠা ও বিনয়ের সঙ্গে থিয়েটারের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবেই । থিয়েটারে দীর্ঘ সময় পার করেও আজও তিনি যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন ঃ "তোমার কি মনে হয় আমি ফাঁকি দিয়েছি ?"[১৬] এই অতন্দ্র জিজ্ঞাসাই তাঁকে থিয়েটারের প্রতি তন্নিষ্ঠ রেখেছে। সেই তন্নিষ্ঠা নিয়েই তিনি নিজের নাটকে

রক্ষা ও পরিচর্যা করেছেন মূল্যবোধকে। সমাজে যখন গভীরতর অসুখ, মানুষ যখন সবরকমভাবেই আশ্রয়হীন, তখন মনোজ মিত্র সব বিপর্যয়ের শেষেও মানুষের মধ্যে আবিষ্কার করেন শুভচেতনা। তলিয়ে যেতে থাকা মানুষের হাত ধরে তাকে উত্তীর্ণ করে দেন আলোর দিকে। নিজের নাট্যরচনার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মনোজ মিত্র বলেছেন ঃ "My focus has always been on preservation and nourishment of values, of human resources."[১৭] থিয়েটারের সবরকম কাজের মধ্যে নাটক লেখাকেই তিনি প্রথম স্থান দিতে চেয়েছেন ঃ " নিশ্চিতভাবে প্রথমেই নাট্যকার তারপর অভিনেতা ও শেষে পরিচালককে রাখব। কারণ, লেখাই আমার ফার্স্ট লাভ।"[১৮] আদ্যন্ত এই মঞ্চ-মানুষের সঙ্গে যাঁরা বিভিন্নসময় কাজ করেছেন তাঁদের লেখা থেকে জানা যায়, মনোজ মিত্র সবসময়ই একটু অন্তর্মুখী, কিছুটা যেন লাজুক। নিজের কাজকর্ম নিয়ে তিনি কখনোই উচ্চকণ্ঠ নন। প্রাথমিকভাবে তাঁকে একটু দূরের মানুষ বলে মনে হলেও প্রথম আলাপের গন্ডি পার হলেই তিনি একেবারে বন্ধুজন। সেই বন্ধুজনোচিত স্বভাবের স্বীকৃতি মেঘনাদ ভট্টাচার্যের লেখায় ঃ

> " এক দরদী মনের মানুষ মনোজদা খুব সহজেই বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশে গেছেন। তাই নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা মনোজ মিত্র আমার কাছে সাধারণের চেয়ে অনেক বড় মাপের মানুষ।"[১৯]

ব্যক্তি মনোজ মিত্র যে দরদী মনের অধিকারী সেই দরদই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নাট্যরচনায়। অসহায়, দুর্বল, প্রান্তিক মানুষের জন্য তাঁর দরদ এবং সহানুভূতি প্রায় প্রতিটি নাটকেই লভ্য। তাঁর নায়কেরা প্রায় সকলেই জীবনের নিম্নস্তরের মানুষ, তারা সমাজের বিশিষ্ট কেউ নয় — তাদের জন্যই মনোজ মিত্রের দরদ ও সহানুভূতি। বন্ধু অশোক মুখোপাধ্যায় ধরিয়ে দিয়েছেন মনোজ মিত্রের রসবোধ ও দরদের দিকটি ঃ

> "তার রসবোধ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও খুঁজে পায় মজার বা উপভোগের অফুরন্ত উপাদান। যে কোনও মানুষের মধ্যে, যে কোনও ঘটনার মধ্যে, যে কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে এত যে রঙ্গের সম্ভাবনা ছিল, মনোজের সঙ্গে না থাকলে তা বোধহয় ধরাই পড়ত না। কিন্তু শুধু রঙ্গ নয়। ... কাছ থেকে দেখলে ধরা পড়বেই, মানুষের জন্য গভীর মমতা ও ভালবাসায় ভরে আছে মনোজের ভেতরটা।"[২০]

এই মমতা ও ভালোবাসাই মানুষের দুঃখে তাকে ব্যথিত করে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রণোদিত করে — যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি নিজের লেখায়। বাহ্যত যে মনোজ মিত্র রঙ্গপ্রিয় ও মজাদার, তার ভেতরে রয়েছে একটি গভীর মন। সেই গভীরতাও উন্মোচিত করেছেন অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ "রঙ্গ ও মমতার বিচিত্র মিশেলে তৈরি যে আকর্ষণীয় মনোজ, আর একটু ভেতরে ডুব দিলেই তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় একজন নিঃসঙ্গ লোককে, একজন কবিকে।"[২১] এই নিঃসঙ্গতা, এই কবিজনোচিত অনুভূতিও একজন প্রকৃত শিল্পীর সম্পদ। সেই শিল্পীই অভিনেতা হিসেবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন বাঞ্ছারাম, ('সাজানো বাগান'), গজমাধব ('পরবাস') যম ('নরক গুলজার') দ্বৈপায়ন ('ছায়ার প্রাসাদ') প্রভৃতি চরিত্রে, যে চরিত্রগুলি 'কান্না-হাসির মাঝখানে, কৌতুক-বিষাদের মাঝখানে একটি ধূপছায়া জগতের বাসিন্দা'। শিল্পী মনোজ মিত্র, স্রষ্টা মনোজ মিত্রের আছে আর এক সত্তা — মননশীল প্রাজ্ঞ সত্তা। সেই সত্তাটি ঃ "প্রবন্ধ রচনায়, বক্তৃতায়, গ্রন্থ-সমালোচনায়, নাট্যপ্রশিক্ষণে পারদর্শী এবং জঙ্গম।"[২২] কিন্তু এই সমস্ত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মানুষদের কাছে মনোজ

মিত্রের প্রধানতম পরিচয় — তিনি বন্ধু। বয়স বা মর্যাদার গন্ডি অতিক্রম করে তিনি একান্ত নিকটজন। সেই বন্ধুজনের প্রতি নিজের মুগ্ধতা ব্যক্ত করেছেন অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ ''মতান্তরকে সে সম্যক শ্রদ্ধা করে অথচ মনান্তর ঘটতে দেয় না। ক্ষমতা ও খ্যাতিকে অবহেলায় পেছনে রেখে সে মনের সঙ্গে মনের সেতুকে মজবুত করে তোলে।''[২৩] 'শিল্পস্রষ্টা'র চেয়েও তিনি বড় 'সম্পর্কের স্রষ্টা' হিসেবে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র - দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা - ৭৩, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ.১৫

২) ঐ, পৃ.১৬

৩) ঐ, পৃ.১৯

৪) ঐ, পৃ.১৯

৫) আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র - সাক্ষাৎকার ব্রাত্য বসু - ব্রাত্যজন নাট্যপত্র - তৃতীয় খন্ড - নভেম্বর ২০১১, পৃ.৫৯৩

৬) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ.২০

৭) ঐ, পৃ.২১

৮) ঐ, পৃ.২৯

৯) ঐ, পৃ.৩০

১০) ঐ, পৃ.২১

১১) আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র - সাক্ষাৎকার ব্রাত্য বসু - ব্রাত্যজন নাট্যপত্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৬০৩

১২) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ. ৫০

১৩) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ - ১০,শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ - মাঘ ১৪০৬, পৃ.১২২

১৪) ঐ, পৃ.৪৪

১৫) ঐ, পৃ.৫৪

১৬) আলাপচারিতায় মনোজ মিত্র - সাক্ষাৎকার ব্রাত্য বসু - ব্রাত্যজন নাট্যপত্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৬১৮

১৭) To preserve and nourish values - Interview to Sankar Majumder - The Statesman - 28/10/2005

১৮) মঞ্চের মানুষ - রবিশঙ্কর মিশ্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকার - আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৮/১২/১৯৯৩

১৯) একজন বড় মাপের মানুষ - মেঘনাদ ভট্টাচার্য - আজকাল - ০৯/০৮/১৯৯২

২০) মতান্তরকে শ্রদ্ধা করে, মনান্তর ঘটতে দেয় না - অশোক মুখোপাধ্যায় - আজকাল - ০৯/০৮/১৯৯২

২১) ঐ

২২) ঐ

২৩) ঐ